কেমন আছে
এরশাদ শিকদার
পরিবার ও গডফাদাররা

এরশাদ শিকদার। বিচিত্র ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল। খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি কিছুই বাদ দেয়নি সে। একসময় ক্ষমতা ছিল, গডফাদার ছিল, অর্থ আর অস্ত্র ছিল। আজ তার কিছুই নেই। পাপ তাকে ক্ষমা করেনি। ১০ মে তার ফাঁসি কার্যকর হবে। এরশাদ একা অপরাধী ছিল না, তার গডফাদার, সহায়তাকারিরাও অপরাধী। অথচ তাদের কিছু হয়নি... অনুসন্ধান করেছেন **মামুন রহমান**

নরঘাতক খুলনার ত্রাস এরশাদ শিকদারের অবশেষে ফাঁসি হচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ১০ মে রাতে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হবে। এর মাধ্যমে অবসান ঘটবে বহুল আলোচিত এক ভয়ঙ্কর ঘাতকের কুকর্মময় জীবনের। বর্তমানে গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। সবাই প্রতীক্ষায় আছেন ১০ মের জন্য। নরপিশাচ এরশাদ শিকদারকে কখন এবং কিভাবে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে সে সংক্রান্ত সংবাদ তারা গোগ্রাসে গিলছেন। অপরদিকে দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসায় কারা কর্তৃপক্ষও জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে এরশাদকে ফাঁসিতে ঝুলাতে। কৃতকর্মের পরিণতি মেনে নিয়ে তার স্বজনরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাকে কোথায় সমাহিত করা যায়। তবে খুনি এরশাদ এখনো জানে না তার শেষ পরিণতির কথা। তাকে জানানো হবে ফাঁসির মঞ্চে নেয়ার ঘণ্টা দুয়েক আগে। আর তার আত্মীয়স্বজনকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে দু'দিন আগে। জেল সুপারের অনুমতি সাপেক্ষে এরশাদ শিকদারের প্রাপ্তবয়স্ক ও মর্যাদাবান ১২ জন আত্মীয়স্বজন ফাঁসির কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

যেভাবে ফাঁসি কার্যকর করা হবে

১১ মে প্রথম প্রহরেই মৃত্যুর স্পর্শ পেতে হবে ঘাতক এরশাদ শিকদারকে। সে যেমন অসংখ্যা তরতাজা যুবককে তার ফাঁসি ঘরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, ঠিক তাকেও শেষ পরিণতি হিসেবে ফাঁসিতে ঝুলে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১০ মে বিকেলে এরশাদের আত্মীয়স্বজন সর্বশেষ তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। রাতে ফাঁসি কার্যকর করার আগে তাকে জানিয়ে দেয়া হবে তার চরম পরিণতির কথা। এরপর তাকে গোসল করানো হবে। কারা মসজিদের ইমাম তাকে তওবা পড়াবেন। এরপর তাকে তুলে দেয়া হবে জল্লাদের হাতে। জল্লাদ তাকে ফাঁসির মঞ্চে নেবে। তারপর কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হবে তার মুখ। রাত ১২টা ১ মিনিটে তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হবে। এ সময় সেখানে জল্লাদ ছাড়াও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কমিশনার, সিভিল সার্জন, জেল সুপার ও জেলার উপস্থিত থাকবেন। এরশাদের ফাঁসি কার্যকর করার জন্য জোর প্রস্তুতি চলছে। ইউরোপে তৈরি এক ইঞ্চি ব্যাসের ম্যানিলা দড়ি দিয়ে এরশাদের ফাঁসি কার্যকর করা হবে। মাখন ও সবরিকলা মিশিয়ে তরল করে ঐ দড়িতে মাখানো হবে। ফাঁসি কার্যকর হওয়ার পর এরশাদের নিথর দেহ নামিয়ে ময়নাতদন্ত করার পর সকালে তার আত্মীয়স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

১৯৯৯ সালে ধরা পড়ার পর জেলে এরশাদ শিকদার

এরশাদের শেষ ঠিকানা

ফাঁসি হওয়ার পর এরশাদ শিকদারের লাশ কোথায় দাফন করা হবে তা এখনো ঠিক হয়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন তার স্বজনরা। এরশাদের ঘনিষ্ঠজনরা চাচ্ছেন, এরশাদকে তার স্বপ্নের বাড়ি স্বর্ণ কমলের পাশেই সমাহিত করতে। কিন্তু তার ভাইয়েরা চাচ্ছেন তাকে তার পিতা বন্দে আলী শিকদারের কবরের পাশেই দাফন করা হোক। কিন্তু কোনো কিছুই এখনো ঠিক হয়নি। কোথায় তার কলঙ্কিত সমাধি হবে তা ঠিক করবে এরশাদ নিজেই। তার মরদেহ দাফনের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেবে তার পরিবার।

১৯৯৯ সালের ১৬ মে দুর্ধর্ষ অপরাধী এরশাদ শিকদারের ডেরা বরফকলে আমন্ত্রণ জানানো হয় আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ মুনির, ছাত্রলীগের জেলা আহ্বায়ক অসিত বরণ বিশ্বাস, যুবলীগ নেতা খালিদসহ আরো কয়েকজনকে। উদ্দেশ্য ৪ ও ৫ নং ঘাটের ইজারা পাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা। কারণ সৈয়দ মুনির একাধিকবার ঐ ঘাট দু'টি ইজারা নিলেও এবার তা নিতে চায়

এরশাদ শিকদার। এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বিরোধও হয়। ঘাটের ইজারা আর বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এরশাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তার বরফকলের আস্তানায় যায়। নিজের ডেরায় শত্রুদের পেয়ে হিংস্র বাঘের মতো ফুঁসে ওঠে এরশাদ। আক্রমণ করে সৈয়দ মুনির ও খালিদসহ অন্যদের ওপর। রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মক জখম করে সৈয়দ মুনিরকে। ব্যাপক পিটুনির শিকার যুবলীগ কর্মী খালিদ হোসেন হাসপাতালে মারা যান। এ ব্যাপারে ১৯ মে খুলনা থানায় মামলা হলে পুলিশ তদন্ত সাপেক্ষে এরশাদ শিকদারসহ তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। ঐ মামলার রায় হয় ২০০০ সালের ৩০ এপ্রিল। রায়ে খুলনার অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের বিচারক এম হাসান ইমাম এরশাদ শিকদারের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে এরশাদ হাইকোর্টে আপিল করলেও হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখেন। এরপর সে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করে। সুপ্রিম কোর্টও নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখে। ২২ মার্চ এ রায় ঘোষণা করা হয়। ৬ এপ্রিল মৃত্যুদন্ড বহাল রাখার লাল চিঠি পৌঁছায় খুলনা কারাগারে। এ দুঃসংবাদ জানার পর বিচলিত হয়ে পড়ে এরশাদ। কড়া নিরাপত্তার মধ্য থেকেই সে ২৪ মার্চ টুথ ব্রাশের খাপ ভেঙে পেট কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। জানা যায়, তার ক্ষতটা এতোই বেশি ছিল যে তার ভুঁড়ি বেরিয়ে যায়। তবে তার সে চেষ্টা সফল হয়নি। কয়েকদিনের চিকিৎসায় সেরে ওঠে এরশাদ। এরপর ৯ এপ্রিল এরশাদ প্রাণভিক্ষা চেয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করে। যা নাকচ করে দেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। অর্থাৎ খুনি এরশাদের বেঁচে থাকার আর কোনো পথই খোলা থাকলো না। বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তার আবেদন নাকচ করার ২১ থেকে ২৮ দিনের মধ্যেই ফাঁসি হওয়ার কথা। তারই আলোকে ১০ মে রাতে অর্থাৎ ১১ মে প্রথম প্রহরে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে এরশাদ শিকদারকে। সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটবে তার দীর্ঘ কুকর্মময় জীবনের। তবে এই একটি নয় ঘাতককুল শিরোমণি এরশাদের আরো ৬টি মামলায় মৃত্যুদন্ড হয়েছে।

পেছনের কথা

এরশাদ শিকদারের পুরো নাম এরশাদ আলী শিকদার। পিতার নাম বন্দে আলী। আদি নিবাস ঝালকাঠি জেলার নলছিটি থানার মাদারঘোনা গ্রামে। ক্ষুদ্র ব্যবসা ছিল তাদের। তবে তার পিতা চুরি-ডাকাতির সঙ্গেও জড়িত ছিল। তবে এরশাদ শিকদারের দাবি, সে সচ্ছল এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান ছিলো। ১৯৬৬-৬৭ সালের দিকে এরশাদ বড় ভাই

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১৯৯৯ সালের ২৯ অক্টোবর সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনীতে এরশাদ শিকদার

আশরাফ শিকদারকে সঙ্গে নিয়ে খুলনায় আসে। এখানে এসে তারা ঘাটে কুলির কাজ নেয়। তাদের মা কাজ করে বিভিন্ন বাসা-বাড়িতে। এভাবে এরশাদ আস্তানা গাড়ে খুলনায়।

রাঙা চোরা

ঘাট এলাকায় কাজ করতে করতে এরশাদ এক সময় চুরি- ছেঁচড়ামি শুরু করে। ট্রলার থেকে চুরি করে গম, মাছ ও জাহাজ থেকে তেল। যা বিক্রি করে এরশাদ কিছু নগদ অর্থও জোগাড় করে। সেই সঙ্গে গড়ে তোলে একটি চক্র। যারা সবাই এরশাদের অনুগত ছিল। এই গ্রুপটি রাঙা চোরা গ্রুপ হিসেবেই পরিচিত ছিল। এর কারণ একাধিকবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার পর চোর হিসেবে এরশাদ শিকদারের আলাদা একটা পরিচিতি গড়ে ওঠে। তবে সে সুদর্শন ও ফর্সা হওয়ায় ব্যঙ্গ করে ঘাট এলাকার মানুষ তাকে রাঙা চোরা বলতো। এই রাঙা চোরা দলটিই এক সময় নজরে পড়ে ঘাটের নিয়ন্ত্রক কাশেম সরদারের। মূলত সে-ই এরশাদের প্রথম গডফাদার। কাশেমের ছত্রছায়ায় থেকে এরশাদ ও তার রাঙা চোরা বাহিনী অপকর্মের মাত্রা বাড়াতে থাকে।

রামদা বাহিনী

কাশেম সরদারের সহায়তায় ঘাট এলাকায় শক্ত আস্তানা গড়ে তোলার পর এরশাদ ও তার রাঙা চোরা বাহিনী আস্তে আস্তে বেপরোয়া হতে থাকে। এক পর্যায়ে বয়সের কারণে কাশেম সরদারের পরিবর্তে নতুন ঘাট মালিক হয়ে আসে তাদেরই একজন আঞ্জু সরদার। তার সঙ্গেও এরশাদ সখ্য গড়ে তোলে। '৭৬-'৭৭ সাল থেকে এরশাদ ও তার দল এলাকায় রামদা নিয়ে চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি শুরু করে। তারা এতোটাই বেপরোয়া ছিল যে, তার বাহিনীর নাম হয় রামদা বাহিনী। '৭৮ থেকে '৮২ সাল পর্যন্ত এই বাহিনী বেপরোয়াভাবে চুরি-

১০ মে বিকেলে এরশাদের আত্মীয়স্বজন সর্বশেষ তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। রাতে ফাঁসি কার্যকর করার আগে তাকে জানিয়ে দেয়া হবে তার চরম পরিণতির কথা। এরপর তাকে গোসল করানো হবে। কারা মসজিদের ইমাম তাকে তওবা পড়াবেন। এরপর তাকে তুলে দেয়া হবে জল্লাদের হাতে

ডাকাতির পাশাপাশি ঘাটসংলগ্ন রেলওয়ের লাইন, স্লিপার ও কাঠ চুরি করতো। এভাবে তারা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠলে এক পর্যায়ে ঘাট থেকে আঞ্জু সরদারকেই উৎখাত করে। ঘাটে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর শুরু করে মাছ ধরা ট্রলার থেকে চাঁদাবাজি, গমের বস্তা চুরি করে পাচার, সিমেন্টের বস্তা খুলে তাতে মাটি-বালি মিশিয়ে বিক্রি করে চাঁদাবাজি। এভাবে এরশাদ সবার নজর কাড়ে। ১৯৮৩ সালে স্বৈরাচার এরশাদের শাসনামলে ঘাট এলাকা থেকে কমিশনার পদে নির্বাচন করেন সে সময়ের গডফাদার কাজী আমীন। এরশাদ তার পক্ষে নির্বাচন করে কাজী আমীনের দৃষ্টি কাড়ে। তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে সখ্য। এরপর কাজী আমীন মেয়র মনোনীত হলে এরশাদ শিকদারের দাপট আরো বেড়ে যায়। কাজী আমীনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ৪ ও ৫ নম্বর ঘাটের একচ্ছত্র অধিপতি বনে যায় এরশাদ। তার জীবন যাপনেও আসে ব্যাপক পরিবর্তন। তখন থেকেই রাঙা চোরা, কুলি সরদার আর রামদা বাহিনী প্রধান এরশাদ আলী হয়ে যায় এরশাদ শিকদার। তার পরের কাহিনী ইতিহাস। মূলত কাজী আমীনের কারণেই এরশাদ তার অপকর্মের দ্রুত বিস্তার ঘটাতে পারে।

রাজনীতিতে এরশাদ

খুলনায় মোটামুটি শক্ত অবস্থান তৈরির পর এরশাদ আরো এগুতে থাকে। তাকে এগুতে সহায়তা করেন কাজী আমীন। তার একটাই কারণ, অপর জাপা নেতা শেখ আবুল কাশেম। চরম দ্বন্দ্ব ছিল তাদের দু'জনের মধ্যে। কাজী আমীন এরশাদকে ব্যবহার করে কাশেমকে ঘায়েল করতে চাইতেন। কিন্তু ধুরন্ধর এরশাদ গোপনে আবুল কাশেমের

সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে। তাদের দু'জনকেই সে গোপনে ঘাট এলাকা থেকে লুটপাট করা অর্থের বখরা দিত। যে কারণে কাজী আমীনও এরশাদকে কাশেমের ব্যাপারে খুব চাপ দিতে না। এভাবে এরশাদ শিকদারের সঙ্গে এক সময় পরিচয় হয় খুলনার তৎকালীন মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) এইচ এম এ গফফারের। কাজী আমীনের কারণেই ঐ মন্ত্রীর সান্নিধ্য পান এরশাদ। তারপর তার সঙ্গে যোগাযোগ হয় তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর। এরশাদের দাপটের কথা জেনে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয় বাগেরহাটের ট্রেন লাইন উঠিয়ে দেয়ার। ভোলার মন্ত্রী নাজিউর রহমান মঞ্জুর সঙ্গেও সখ্য গড়ে তোলে এরশাদ। তারপর সিঁড়ি বেয়ে একেবারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদুল হাসান পর্যন্ত। '৮৮ সালে কুলি-মজদুর আর রাঙা চোরা ও রামদা বাহিনীপ্রধান এরশাদ শিকদার বনে যায় ওয়ার্ড কমিশনার। ভোটারবিহীন ঐ নির্বাচনে তাকে জনপ্রতিনিধি হতে সাহায্য করেন নাজিউর রহমান মঞ্জুর। এরপর সে খুলনার আরেক শীর্ষনেতা এ এস এম এ রবের সঙ্গেও সখ্য গড়ে তোলে। নোয়াখালীর লোক হওয়ার কারণে রবের ঘনিষ্ঠতা ছিল ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের সঙ্গে। জানা যায়, মওদুদ আহমদের সঙ্গেও রব এরশাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এভাবেই রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটে এরশাদ শিকদারের। '৯০ সালে স্বৈরশাসনের পতন ঘটলেও পতন ঘটেনি এরশাদ শিকদারের, বরং সে গোপনে সখ্য গড়ে খুলনার স্থানীয় বিএনপি নেতাদের সঙ্গে। এর মধ্যে শেখ রাজ্জাক আলী অন্যতম। অভিযোগ রয়েছে, সাবেক এই স্পিকারের মাধ্যমে এরশাদ শিকদার সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলে। খুলনা সফরে এসে আব্দুর রহমান বিশ্বাস যেভাবে এরশাদের খোঁজ-খবর নিয়েছিলের তাতে অনেকেই নাকি অবাক হয়েছিলেন। এরশাদের মূলনীতি ছিল উচ্চমহলে দহরম মহরম গড়ে তোলা। যে কারণে কুলি-মজদুর থেকে কোটিপতি হতে তার খুব বেশি সময় লাগেনি। সময় লাগেনি ক্ষমতায় রদবদলের পর আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনেও। ধুরন্ধর এরশাদ এ ক্ষেত্রে সুযোগ বুঝে কাউকে না কাউকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে। '৯৬-র নির্বাচনে বিএনপিকে হারিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে এরশাদ সিঁড়ি খুঁজতে থাকে ঐ দলে যোগ দেয়ার জন্য। পেয়েও যায় সে। সখ্য গড়ে তোলে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা শেখ হেলালের সঙ্গে। ব্যস, আর খুব বেশি সমস্যা হয়নি তার। সব বাধা-

যুবলীগ নেতা খালিদ হত্যাকান্ডের পর সুজার সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে এরশাদ। এমনকি সুজাকেই সে দেখে নেয়ার হুমকি দেয়। এরশাদ এই বলে সুজাকে শাসায় যে, এ নিয়ে যদি তিনি বাড়াবাড়ি করেন তাহলে সে তার বাড়ির ইট খুলে আনবে। এতে চরম ক্ষুব্ধ হন মোস্তফা রশিদী সুজা। তিনি পাল্টা হুমকি দিয়ে বলেন, 'তোর সাম্রাজ্যের পতন না ঘটিয়ে সুজা খুলনায় ঢুকবে না'

এরশাদ শিকদার ও তার দেহরক্ষী নূরে আলম

বিপত্তি মাড়িয়ে এরশাদ '৯৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর খুলনা সার্কিট হাউসে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়। তখনো তার মাথায় হুলিয়া ছিল। ঐ সময় সে ছিল আওয়ামী লীগ নেতা মোসলেম হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি। '৯৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মোসলেম নিহত হন ঘাট সংক্রান্ত বিরোধে। এরশাদই তাকে হত্যা করে। যদিও আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ার পর ঐ মামলার বারোটা বেজে যায়।

নেতাদের চাপে কোণঠাসা হয়ে পড়েন মামলার বাদী ও ওয়ার্ড কমিশনার বাবুল। মামলায় খালাস পেয়ে যায় এরশাদ। ঐ মামলা থেকে রেহাই পেয়ে বাড়ি ফিরে সে দুধ দিয়ে গোসল করে পাক-পবিত্র হয়।

এরশাদ সাম্রাজ্যের পতন

ফুটপাত থেকে রাজপ্রাসাদে ওঠা এরশাদ শিকদারের পতন শুরু হয় মূলত আওয়ামী লীগ আমলেই। যারা তাকে এরশাদ আলী থেকে এরশাদ শিকদার করেছিল, যারা ছিল তার গডফাদার, তাদের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়েই ধরা খায় এরশাদ শিকদার। যাদের অন্যতম আওয়ামী লীগের সাবেক হুইপ মোস্তফা রশিদী সুজা। যুবলীগ নেতা খালিদ হত্যাকান্ডের পর সুজার সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে এরশাদ। এমনকি সুজাকেই সে দেখে নেয়ার হুমকি দেয়। এরশাদ এই বলে সুজাকে শাসায় যে, এ নিয়ে যদি তিনি বাড়াবাড়ি করেন তাহলে সে তার বাড়ির ইট খুলে আনবে। এতে চরম ক্ষুব্ধ হন মোস্তফা রশিদী সুজা। তিনি পাল্টা হুমকি দিয়ে বলেন, 'তোর সাম্রাজ্যের পতন না ঘটিয়ে সুজা খুলনায় ঢুকবে না।' এরপর তিনি ঢাকা চলে যান। পাল্টে যায় দৃশ্যপট। যে এরশাদকে পুলিশ খাতির-তোয়াজ করতো, তাকে ধরার জন্য তাদের তোড়জোড় বেড়ে যায়। সাঁড়াশি অভিযান চলতে থাকে ঘাট এলাকায়। হতবিহ্বল এরশাদ যোগাযোগ শুরু করে উচ্চ মহলে। কিন্তু তার সব চেষ্টা বিফলে যায়। আওয়ামী লীগ থেকে তাকে বলা হয় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে পরে মুক্ত করে আনা হবে। এ আশ্বাস পেয়েই এরশাদ '৯৯ সালের ১১ আগস্ট পুলিশের কাছে ধরা দেয়। যে সময় সে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিল তখন ছিল ২৩ মামলার পলাতক আসামি। আর যখন গ্রেপ্তার হয় তখন পুলিশ আরো ৯টি মামলা খুঁজে পায়। যার মধ্যে ২৭টিতেই সে বেকসুর খালাস পায়। প্রাণের ভয়ে কেউ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারেনি। কিন্তু সে গ্রেপ্তার হওয়ার পর দৃশ্যপট বদলে যায়। মানুষ সাক্ষী দেয় তার অপকর্মের বিরুদ্ধে। যে কারণে খালিদ হত্যা মামলাসহ জয়নাল, ফটিক, সিরাজ, নান্টু, পান্না ও আকিমুল হত্যা মামলায় তার ফাঁসি হয়। এ ছাড়া ৪টি হত্যা মামলায় হয় যাবজ্জীবন কারাদন্ড। বর্তমানে আরো ২০টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ভয়ঙ্কর খুনি এরশাদ উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কখনো পিছপা হয়নি। এ জন্য সে যখন যাকে সমস্যা মনে করতো তাকে হত্যা করতো নৃশংসভাবে। তার মৃত্যুকূপ বরফ কলে নিয়ে কখনো গুলি করে, কখনো কুপিয়ে আবার কখনো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করতো তাদের। তারপর লাশ ফেলে দিত ভৈরব নদীতে। এরশাদ শিকদার ও তার অন্যতম দুই সহযোগী নূরে আলম ও লিয়াকত গ্রেপ্তার হওয়ার পর অনেকের হাড়গোড় ঘাট এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ছাড়াও এরশাদ অনেক যুবতী ও গৃহবধূর ইজ্জত লুটে নিয়েছে। অর্থের বিনিময়ে ভোগ করেছে অসংখ্য নারীকে। প্রধান দেহরক্ষী নূরে আলমের স্ত্রীকেও সে ছাড় দেয়নি। একাধিকবার জোর করে এরশাদ তাকে ভোগ করে। বিষয়টি জানতো নূরে আলম। কিন্তু প্রাণের ভয়ে সে প্রতিবাদ করতে পারতো না। এরশাদ ধরা পড়ার পর আজ তার যে সাজা হচ্ছে এতেও নূরে আলমের অবদান রয়েছে। কারণ সে-ই অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়। সে-ই প্রথম স্বীকার করে যে অন্তত ২৩টি হত্যাকান্ডের সাক্ষী সে।

যুবলীগ নেতা খালিদ হত্যা, মোস্তফা রশিদী সুজার সঙ্গে বিরোধ ছাড়াও আরো একটি ঘটনায় এরশাদ বিপাকে পড়ে যায়। তাহলো আওয়ামী লীগ নেতা চান মিয়ার স্ত্রী শোভাকে বিয়ে করা। আওয়ামী লীগে যোগ দিলেও একটি হত্যা মামলায় পুলিশ খুঁজতে থাকে তাকে। এ অবস্থায় এরশাদ আত্মগোপন করে আওয়ামী লীগ নেতা চান মিয়ার বাড়িতে। সেখানে থাকা অবস্থায় এরশাদ শিকদার চান মিয়ার স্ত্রী, দুই সন্তানের জননী শোভার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে এবং তাকে বিয়েও করে। এ নিয়ে খুলনায় তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। '৯৯-র মাঝামাঝি সময়ে এসব কারণে তাকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

সেই শোভা এখন এরশাদের কন্যার জননী। যাকে বিয়ের চেষ্টা করছেন খুলনার এক গডফাদারসহ একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। যদিও শোভা বলেছেন, তিনি এখন ওসব ভাবছেন না। মানসিকভাবে তিনি বিপর্যস্ত। তার চিন্তা এখন শুধু কন্যা এশাকে বড় করা।

এরশাদ শিকদারের পৈশাচিক ফাঁসিঘর

আওয়ামী লীগে যোগ দিলেও একটি হত্যা মামলায় পুলিশ খুঁজতে থাকে তাকে। এ অবস্থায় এরশাদ আত্মগোপন করে আওয়ামী লীগ নেতা চান মিয়ার বাড়িতে। সেখানে থাকা অবস্থায় এরশাদ শিকদার চান মিয়ার স্ত্রী, দুই সন্তানের জননী শোভার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে এবং তাকে বিয়েও করে। এ নিয়ে খুলনায় তোলপাড় শুরু হয়ে যায়

এরশাদ শিকদারের স্বজনরা কে কোথায়

দেশের সেরা খুনি এরশাদ শিকদার কারাগারে যাওয়ার পর ব্যাপক ওলট-পালট হয়ে যায় তার সাম্রাজ্যে। তার বিশাল বাহিনী ভেঙে খান খান হয়ে যায়। যারা ছিল তার দেহরক্ষী-সিপাহসালার, পরিস্থিতির কারণে তারা সব পিছুটান দেয়। কেউ কেউ হয়ে যায় রাজসাক্ষী। এদের মধ্যে অন্যতম নূরে আলম। বলা যায়, সে গ্রেপ্তার হওয়ার পরই এরশাদ শিকদারের নৃশংসতার ভয়াবহ সব খবর ফাঁস হয়ে যায়। এরশাদ শিকদারের সবচেয়ে কাছের মানুষ সেই নূরে আলম এখন কারাগারে। কারাগারে রয়েছে তার আরো কয়েকজন কাছের মানুষ বাহিনীর সেরা চাঁই জামাই ফারুক, ল. ম লিয়াকত, নাসির খান, জামাই ইদ্রিস প্রমুখ। এদের মধ্যে লিয়াকত এরশাদের ফাঁসি কার্যকর করার জন্য জল্লাদ হতে চেয়েছে। এর জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৬০ দিনের যে সাজা মওকুফ হওয়ার কথা সেজন্য নয়, লিয়াকত জল্লাদ হতে চায় মূলত কিছুটা হলেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। এরশাদের অসংখ্য নৃশংসতা তারা প্রত্যক্ষ করেছে। তাতে অংশ নিয়েছে। এবার সে দেখতে চায় এরশাদের করুণ পরিণতি। কিন্তু নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তাজনিত সমস্যার কারণে লিয়াকতের সে ইচ্ছা পূরণ নাও হতে পারে। সম্ভবত অন্য কোনো কারাগার থেকে জল্লাদ আনা হতে পারে। এরশাদের এই সেরা ৫ সহযোগী ছাড়া মোটামুটি অন্য সবাই বাইরে রয়েছে। তারা রঙ বদলে, দল বদলে রয়েছে বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায়। তাদের কয়েকজন হলো সেন্টু, ইউনুস, কামাল, লতিফ, মতিউর রহমান মতি, মন্টু, আশরাফ, বড় মিয়া, আউব মুন্সি, কুঁজো আলতাফ প্রমুখ। এদের সিংহভাগই এখন ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় থেকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড করে বেড়াচ্ছে। কুঁজো আলতাফ ঘাট এলাকার ত্রাস। সে মোমিন বাহিনীর সদস্য। অপরদিকে আউব মুন্সি করে ভেজাল সিমেন্টের ব্যবসা। অন্যরাও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত। এদের সাবেক গডফাদার এরশাদকে যেমন আগে পুলিশ কিছু বলতো না উপরিমহলের কারণে, এখন একই কারণে এদের বলে না। যে কারণে জঘন্য ব্যক্তির চাঁই হওয়া সত্ত্বেও তারা বহাল তবিয়তে রয়েছে। আর সব বোঝা টানতে হচ্ছে এরশাদকে। এরশাদের সহযোগী ছাড়াও বহালতবিয়তে আছে তার একান্ত আপনজনরাও। বড় স্ত্রী খোদেজা ৪ ছেলেমেয়ে নিয়ে আছেন স্বর্ণকমলেই। সেখানে তার সঙ্গে থাকেন বড় ছেলে জামাল এরশাদ, মেজ ছেলে কামাল এরশাদ, ছোট ছেলে হেলাল এরশাদ আর মেয়ে ইয়াসমিন সুবর্ণা। বড় ছেলে জামাল চট্টগ্রামে সিএন্ডএফ এজেন্টের ব্যবসা করেন। মেজ ছেলের খুলনায় ফোন-ফ্যাক্সের দোকান রয়েছে। এ ছাড়া তিনি তার পিতার কোটি টাকার বাড়ির ছাদে মুরগির ফার্ম করেছেন। অপর দু'জন লেখাপড়া করেন। তবে যাকে কেন্দ্র করে এরশাদ শিকদারের সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়, সেই দ্বিতীয় স্ত্রী শোভার ঠাঁই হয়নি স্বর্ণকমলে। তিনি ভাড়া বাড়িতে থাকেন খালিশপুর মুজগুন্নি এলাকায়। এরশাদের ছোট মেয়ে এশা তার কাছেই থাকেন। তিনি বর্তমানে একটি বিউটি পার্লার চালান। জানা গেছে, এদের কেউ এখন আর এরশাদ শিকদারকে নিয়ে ভাবেন না। তার অপকর্মের কারণেই তার থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। যদিও বড় স্ত্রী খোদেজা এরশাদের জীবন ভিক্ষা চেয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করেছিলেন। এ ছাড়া তার এক ভাই মাহমুদ আজাদ সোনাডাঙ্গায় ব্যবসা করেন। কিন্তু এরশাদের কারণেই অনেকে তার পরিচয় দেয় না। তবে এরশাদের ছেলে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ সাংবাদিকদের প্রতি। গতকাল তিনি বলেছেন,

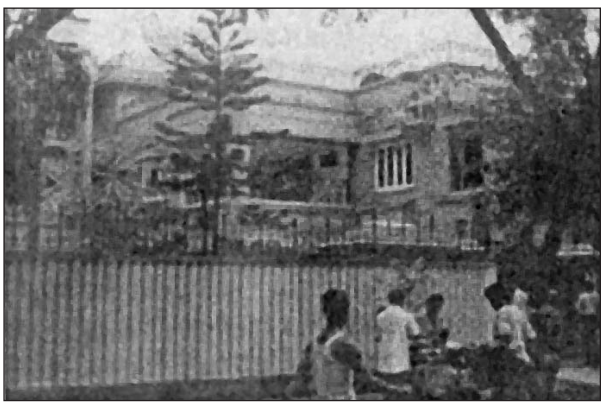

সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এরশাদের বাড়ি স্বর্ণকমল

সাংবাদিকরা যদি এতো লেখালেখি না করতো তাহলে তার বাপের ফাঁসি হতো না।

এরশাদ শিকদারের গডফাদাররা কে কোথায়

ভাগ্যের অন্বেষায় ঝালকাঠি থেকে মা-ভাইয়ের সঙ্গে খুলনায় এসেছিল এরশাদ। কুলি-মজুরের কাজ করতো তখন। অথচ সেই এরশাদ এক সময় কোটিপতি বনে যায়। বনে যায় অপরাধ জগতের ভয়ঙ্কর কিং। কিভাবে সম্ভব তা? সম্ভব হয়েছিলো এ কারণে এরশাদ শিকদার ছিল উচ্চাভিলাষী ও সুচতুর। তার ওপর তার ছিল অসংখ্য গডফাদার। তারা যেমন এরশাদকে ব্যবহার করে, ঠিক তেমনি সেও তাদের ব্যবহার করে সাফল্যের শিখরে ওঠে। এই কাতারে প্রথমে যার নাম আসে তিনি হলেন কাশেম সরদার। তিনিই তখন ৪

ও ৫ নং ঘাট এলাকার মালিক ছিলেন। খুলনায় এরশাদ শিকদারের শক্ত ভিত গড়তে প্রথম তিনিই ভূমিকা রেখেছিলেন। এরপর বয়সের কারণে কাশেম সরদার ঘাটের কর্তৃত্ব তার স্বজন আঞ্জু সরদারের কাছে দিলে এক পর্যায়ে এরশাদ বাহিনী তাকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে। '৮৩ সালে রাজনীতির দুয়ার খুলে যায় এরশাদ শিকদারের। জাতীয় পার্টির শাসনামলে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন হলে বড়বাজার এলাকা থেকে প্রার্থী হন খুলনার এক গডফাদার কাজী আমীন। ওই নির্বাচনে এরশাদ ও তার রামদা বাহিনী কাজ করে কাজী আমীনের পক্ষে। বলা যায়, তিনিই ছিলেন তার প্রথম রাজনৈতিক গডফাদার। নির্বাচনে কাজী আমীন জিতে যান এবং এক পর্যায়ে তিনি মেয়র মনোনীত হন। দাপট বেড়ে যায় এরশাদ শিকদারের। এরপর গোপনে সখ্য গড়ে তোলে কাজী আমীনের প্রবল বিরোধী অপর জাপা নেতা শেখ আবুল কাশেমের সঙ্গে। ফলে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে এরশাদ কোনোভাবেই তার অপকর্ম চালাতে বাধার সম্মুখীন হয়নি। কাজী আমীনের সঙ্গে খুলনার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) এইচ এম এ গফফারের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকায় এরশাদ শিকদারও এক পর্যায়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। '৮৬ সালে আঞ্চলিকতার সুযোগ নিয়ে এরশাদ সখ্য গড়ে তোলে তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সঙ্গে। মঞ্জু তাকে ব্যবহার করেন বাগেরহাট থেকে রেললাইন উঠিয়ে দেয়ার কাজে। এরই মাঝে এরশাদ সখ্য গড়ে তোলে ভোলার নাজিউর রহমান মঞ্জুর সঙ্গে। তার বিশেষ ভূমিকার কারণেই এরশাদ '৮৮ সালের ভোটারবিহীন নির্বাচনে কমিশনার বনে যান। খুলনা চেম্বারের সাবেক সভাপতি এসএমএ রবের সঙ্গেও তার সুসম্পর্ক ছিল। তার মাধ্যমে এরশাদ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের সঙ্গে। এমনকি এ সময় এরশাদ তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) মাহমুদুল হাসানের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছিল। এদের মধ্যে মওদুদ আহমদ ছাড়া সে সবাইকেই গডফাদার হিসেবে ব্যবহার করে। জাতীয় পার্টির আমলের এরশাদের এসব গডফাদারদের মধ্যে কাজী আমীন, শেখ আবুল কাশেম এবং এসএমএ রব দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত হয়েছে। জাতীয় পার্টির পতনের পর এরশাদ গডফাদার হিসেবে বেছে নেয় বিএনপির প্রভাবশালী নেতা শেখ রাজ্জাক আলীকে। এমনকি এজন্য সে রাজ্জাক আলীকে একটি গাড়িও উপহার দেয় বলে প্রচার রয়েছে। এরপরেই তার সখ্য ছিল বর্তমান মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন বিএনপি নেতা মজিবার রহমান সারোয়ার ও জহিরুদ্দিন স্বপনের সঙ্গে। এদের মাধ্যমে আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে এরশাদ শিকদারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এছাড়া খুলনা বিএনপির শীর্ষ ও প্রভাবশালী নেতা নজরুল ইসলাম মঞ্জুর সঙ্গে এরশাদের সখ্য ছিল। তাকে এরশাদ গডফাদার হিসেবে ব্যবহার করতো। তবে এক গ্রুপের প্রতিবাদের কারণে এরশাদ কখনো বিএনপিতে যোগ দিতে পারেনি। যোগ দিয়েছিল শ্রমিক দলে। খুলনায় এরশাদ শিকদারের গডফাদার হিসেবে যারা কাজ করেছিল বর্তমানে সবাই বহাল তবিয়তেই আছেন। ধুরন্ধর এরশাদ বিএনপি করলেও গোপনে সখ্য রাখতো আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতার সঙ্গেই। এদের মধ্যে একজন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল। জাহাজ ব্যবহারের সূত্র ধরেই এরশাদ শেখ হেলালের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারপর আস্তে আস্তে হাত বাড়ায় খুলনার নেতাদের দিকে। এ ক্ষেত্রে তাকে সর্বাত্মক সহায়তা করে এরশাদের সাবেক গডফাদার, জাপা নেতা ও মেয়র কাজী আমীন। যিনি পরে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। আবুল কাশেম হত্যা মামলায় কাজী আমীনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিলে এবং কাশেমের ভাইপো খুলনার অপর শীর্ষ সন্ত্রাসী আসাদুজ্জামান লিটু তাকে দেখে নেয়ার হুমকি দিলে এরশাদকে সুযোগ করে দেন আওয়ামী লীগে ঢোকার। তার মাধ্যমেই এরশাদ যোগাযোগ করে খুলনা আওয়ামী লীগের নেতা ও হুইপ মোস্তফা রশিদী সুজার সঙ্গে। এরশাদ শিকদারের আরেক গডফাদার ছিলো ঢাকার প্রভাবশালী নেতা হাজী সেলিম। খুলনায় মদিনা ট্রেডার্স নামে তার একটি বিশাল গোডাউন ছিল যা দেখাশুনা করতো এরশাদই। এছাড়া খুলনা আওয়ামী লীগের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা মঞ্জুরুল ইমামের সঙ্গেও এরশাদের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাদেরকেই সে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতো। এদের মধ্যে মঞ্জুরুল ইমাম গত বছর নিহত হয়েছেন। বাদবাকিরা আছেন বহালতবিয়তেই। রাজনীতিক ছাড়া আর যারা তাকে সহায়তা করতো ও নিত তারা পুলিশ। খুলনার সাবেক পুলিশ কমিশনার আনোয়ারুল ইকবাল ছাড়া সবাই এরশাদের অপকর্মে সহায়তা করে অর্থ হাতিয়ে নিত। এদের কয়েকজন হলো- রকিবুল হুদা, ফজলুল কবীর, হাসমত উল্লাহ, এম কে আই চৌধুরী, মাহবুবুল হক, ফজলুল হক, আব্দুর রহিম ও কাজী নজরুল ইসলাম। এদের অনেকেই বর্তমানে চাকরিতে নেই, অবসর নিয়েছেন। এদের কোনো শাস্তি হয়নি। এ ছাড়াও অন্তত দু'ডজন ওসির নাম পাওয়া গেছে, যারা এরশাদের কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে তার অপকর্মে সহায়তা করতো। তাদের কয়েকজন হলো- রওশন আলী, এম এ গণি, আসহাব হোসাইন, নাজমুল হক, এস এম নাজমুল হক, ইউনুস আলী, আব্দুল মালেক, গিয়াস উদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল কুদ্দুস, দেলোয়ার হোসেন, শাহাবুদ্দিন, সোহরাব আলী, অহিদুজ্জামান, খুরশিদ আলম, কামরুল ইসলাম, এম এ নওয়াজ, আব্দুল কুদ্দুস খান, আব্দুল মালেক , এনামুল হক, ইউসুফ আলী প্রমুখ। তবে এরা এখন কে কোথায় কর্মরত আছে তা জানা যায়নি। এরশাদ শিকদার খুলনায় যে বিশাল অপরাধ জগৎ গড়ে তুলেছিল তাতে এ সমস্ত পুলিশ কর্মকর্তার সহায়তাও কম ছিল না। যদিও তারা বলতো, নেতাদের কারণেই তারা কিছু করতে পারতো না। সেই নেতারাও আছেন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে। ফাঁসি হচ্ছে শুধু এরশাদ শিকদারের।

জাতীয় পার্টির পতনের পর এরশাদ গডফাদার হিসেবে বেছে নেয় বিএনপির প্রভাবশালী নেতা শেখ রাজ্জাক আলীকে। এমনকি এজন্য সে রাজ্জাক আলীকে একটি গাড়িও উপহার দেয় বলে প্রচার রয়েছে। এরপরেই তার সখ্য ছিল বর্তমান মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন বিএনপি নেতা মজিবার রহমান সারোয়ার ও জহিরুদ্দিন স্বপনের সঙ্গে। এদের মাধ্যমে আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে এরশাদ শিকদারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এছাড়া খুলনা বিএনপির শীর্ষ ও প্রভাবশালী নেতা নজরুল ইসলাম মঞ্জুর সঙ্গে এরশাদের সখ্য ছিল

গডফাদারদের কিছুই হলো না

কুলি-মজদুর এরশাদকে যারা এরশাদ শিকদার বানিয়েছিল তাদের কারোরই কিছু হলো না। কৃতকর্মের জন্য এরশাদ ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলছে, অথচ তার গডফাদররা থেকে গেল ধরাছোঁয়ার বাইরে। এ নিয়ে এরশাদ শিকদারের মনেও অনেক কষ্ট। প্রায় সে কারারক্ষীদের কাছে আক্ষেপ করে বলে, 'সব দোষ আমার, একবার যদি ছাড়া পেতাম সব শালার মুখোশ উন্মোচন করে দিতাম।' তবে সে এও জানে, তা আর কোনো দিন হবে না। গডফাদাররা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে। তারা আরো এরশাদ শিকদার তৈরি করবে। তারপর আবার তাকে ধরিয়েও দেবে। নিরাপদে থাকবে শুধু তারা।